উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৯৩ সংখ্যা

নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার

মর্যাদাময় মৃত্যুর অধিকার নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায়কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী চর্চা চলছে। গত সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর এই রায় নিয়ে বক্তব্য বিশেষভাবে নজর কাড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, জীবন হল প্রদীপের মতো, যা প্রতি মুহূর্তে পুড়ে শেষ হচ্ছে। অর্থহীনভাবে বেঁচে থাকা কি সম্মানজনক ? মৃত্যুর অন্ধকার সুড়ঙ্গে মাথা উঁচু করে প্রবেশের অধিকারের কথা বলেছিলেন স্বামীজি। এইসবের প্রেক্ষিতে মানুষ যাতে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার মতো মৃত্যুর অধিকারও অর্জন করতে পারে তার সপক্ষে রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। জন্ম নিলে মৃত্যুও যে অবশ্যম্ভাবী তা সকলেই জানে। তবু রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ সমন্বিত জীবন ছেড়ে চলে যাওয়ার ভাবনা সবার কাছেই অত্যন্ত বেদনার। বিশ্বকবি যতই বলুন, মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তা মেনে নেওয়া বড়ো কঠিন। তবু সবাইকেই একদিন যেতে হবে, এই ধ্রুবসত্য মেনে নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সাধ্যমতো ব্যবস্থা করে আমজনতা। দৈনন্দিন জীবনের পরিশ্রম, দুঃখ, কষ্ট, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি লাঘব করতে অবিরত কাজ করে যান গবেষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিন নিত্যনতুন আবিষ্কার, গবেষণার সম্ভারে ভরে উঠছে এই পৃথিবী, যার মূল সুরই হল মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারের রসদ খোঁজা। আর মৃত্যু ? সেও যাতে মর্যাদাময় হয় তার জন্যও সারা বিশ্বে চর্চা কম হয় না। জড় পদার্থ হয়ে, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার মতো গ্লানি যাতে সহ্য করতে না হয়, তা নিয়ে পাশ্চাত্যে বহুদিন আগেই চর্চা শুরু হয়। ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, কলম্বিয়ায় নিষ্কৃতি মৃত্যু আইনসিদ্ধ হয়েছে। গত মাস থেকে এতে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াও। আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশ, জাপান, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি উন্নত দেশে ইচ্ছামৃত্যু, যেখানে আত্মহত্যায় সহায়তা করা আইনসিদ্ধ। এবার নিষ্কৃতি মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে ভারতও। বিভিন্ন মহল এর পক্ষে-বিপক্ষে মত দিচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে নিষ্কৃতি মৃত্যু নিয়ে অবশ্য বহু নিয়মবিধির কথা বলা হয়েছে। এখানে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার (যা কয়েকটি দেশে আছে) দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র পরোক্ষ নিষ্কৃতি, অর্থাৎ বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে যন্ত্রের সহায়তায় বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা সরিয়ে দেওয়ার অনুমতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজের নিষ্কৃতি মৃত্যু নিয়ে আগাম ইচ্ছাপত্র করার বিষয়েও সংস্থান রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় নিঃসন্দেহে স্বাগত। বিশেষত যে দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যত ব্যবসা হয়ে উঠেছে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তাঁকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রেখে পরিবার-পরিজনকে বিপুল অঙ্কের টাকার বিল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এই ধরনের ব্যবস্থা অনেকের পক্ষেই স্বস্তিদায়ক। যদিও যে দেশে আইনের ফাঁক বাঁচিয়ে দুর্নীতি ক্রমেই এক নিপুণ শিল্প হয়ে উঠেছে, সেখানে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাও কম থাকে না। দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে জড় পদার্থের মতো জীবন্মৃত অবস্থায় থাকা অরুণা সানবাগের মৃত্যু হওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। তাঁর বন্ধু তাঁকে নিষ্কৃতি মৃত্যুর সম্মতি দেওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যদিও তখন তা মেলেনি। সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায় নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও বেশ কিছু নিয়মবিধি করেছে, যা ঠিকমতো মানলে হয়তো দুর্নীতি রোখা সম্ভব হবে। এই বিষয়ে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কোন রোগীকে মরণের নিশ্চিত দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব, একমাত্র তাঁরাই হয়তো তা অনুভব করতে পারেন। উন্নত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধ্যসাধনও করছেন। মরণাপন্ন রোগীর প্রাণরক্ষা তাঁদের কর্তব্যও। কিন্তু একেবারে কোমায় চলে যাওয়া বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি মৃত্যুর সবুজ সংকেত দেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। এই বিষয়ে সরকারেরও কঠোর নজরদারি রাখা জরুরি। প্রিয়জনের মৃত্যু কেউ চান না, আবার তাঁর যন্ত্রণা, দুঃখও সব সময় সহ্য করা যায় না। সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করতে গেলে তাই পরিবারের সম্মতি শুধু নয়, চিকিৎসক ও সরকারের ভূমিকাও ইতিবাচক, গুরুত্বপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইদানীং অর্থলোভে পিতা, মাতা, আত্মীয়দের নির্যাতন, হত্যার মতো নৃশংস ঘটনার নজির কম নয়। নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার এই ধরনের মানসিকতাকে যাতে প্রশ্রয় না দেয় তা দেখা দরকার। এরজন্য সরকার নির্ধারিত বিশেষ কমিটি গঠন শুধু নয়, তারও অবিরত তদারকি প্রয়োজন। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই যেন মেলে নিষ্কৃতির ছাড়পত্র। সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় মৃত্যুপথযাত্রী বহু মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগের সংস্থান যেমন করেছে, তেমনই তার অপপ্রয়োগ যাতে না হয় তাও দেখতে হবে।

অমৃতধারা

আমরা যদি সাধুজীবন অবলম্বন করিতে পারি, তবেই যাহা স্থায়ী তাহার রচনা করিতে পারিব। একজন মানুষ হয়তো একটা কথা বলিল, সে কথা এমন প্রাণপূর্ণ যে তাহার স্পন্দন সংগীতের মতো এক নতুন জীবন আনয়ন করে। আবার আরেকজন হয়তো সেই কথাই বলিল কিন্তু তাহা কেমন যেন অর্থহীন। বলো, মহাপুরুষ কে ? যাঁহার ভিতরে বহুশক্তি সম্মিলিত হইয়াছে। তাঁহার এমন জ্যোতি যে, সে জ্যোতি কাহারও চোখ এড়াইতে পারে না। তিনি যাহা কিছু করেন, সকলেই তাঁহার স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। জ্ঞান বিনা অন্য কিছু কি এই চিত্তশুদ্ধি আনিতে পারে ? সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। যেজন তাহার স্পর্শ লাভ করিয়াছে সে যেমন কোমল ও তেমনি অনুভূতিশীল। নিজের জীবনের সত্যানুভূতি তাহাকে ভগবদ্‌প্রেমে প্রেমিক এবং মানুষের প্রেমে আকুল করিয়াছে। যাঁহার এমন প্রাণ তিনিই যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছেন এবং জ্ঞান তাঁহারই যিনি সাধুজীবন লাভ করিয়াছেন।

আমাদের মন বড়ো বহির্মুখী। আমরা কেবল বাহিরের দিকেই ছুটিয়া যাই। জানি না কী যে অন্তরগৃহ হইতে দূরে সরিয়া গেলে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি একেবারে ক্ষয় হইয়া যাইবে, কারণ আমরা সর্বদাতা জীবন উৎস হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি। বহির্মুখী মানুষই ভুল করে। যেজন সাহায্যের আশায় কেবল বাহিরের দিকেই তাকায় সে প্রায় সব সময়েই নিরাশ হয়। অন্তরতম দেশ হইতে আমরা যথার্থ সহায়তা লাভ করি। অনেক লোকের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা স্বর্গে যাই না। আমাদের মন যখন আধ্যাত্মিকভাবে ভাবময় তখন আমরা বহুজনের সঙ্গ কামনা করি না।

–স্বামী পরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৪৫

পাশাপাশি : ২। বিষ্ণু বা সাপ ৫। উত্তর ভারতে প্রচলিত এক ধরনের উচ্চাঙ্গের দরবারি নৃত্যশৈলী ৬। আচার-আচরণ, জীবনযাপনের রীতিনীতি, হালচাল ৮। গাছের সরু ডাল, ডাঁটা বা লাঠি ৯। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ ১১। তহবিলদার, টাকার হিসাব রক্ষা করেন যিনি ১৩। ঘ্রাণেন্দ্রিয় ১৪। পৃথিবী, মর্ত্যলোক।

উপর-নীচ : ১। জমির চারদিকের সীমানা নির্দেশ, খণ্ডখণ্ড করা জমির অংশ, লাট ২। চারকোনা জমি, বর্গক্ষেত্রাকার বাজার ৩। সাদা ৪। পুত্র ৬। বাবার সহোদর ৭। শৈব উৎসববিশেষ ৮। ঝগড়া, অবনিবনা, বিবাদ ৯। বাণ বা তৃণবিশেষ ১০। স্থান ও সময়, স্থান ও কাল, অবস্থা ১১। সেই সময়ে, সেই ক্ষণে ১২। ফৌজদারি উচ্চ আদালত ১৩। যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছুকে বা কাউকে নির্দিষ্ট করে চেনা যায়।

সমাধান ■ ১৯৪৪

পাশাপাশি : ১। ধনজন ৩। নাটিকা ৫। জবরদখল ৬। মন্দুরা ৭। কামান ৯। জায়গিরদার ১২। রমেশ ১৩। রাজদ্বার।

উপর-নীচ : ১। ধরাধাম ২। নসিব ৩। নারদ ৪। কামাল ৫। জরা ৭। কার ৮। নবাঙ্কুর ৯। জামির ১০। গিরীশ ১১। দাদরা।

সেই বিজ্ঞ যুবক এবং পৃথিবীব্যাপী খাটো মানুষের দাপট

রমাপদ চৌধুরি

সুনীতিবাবুর নির্জন নিঃশব্দ বসার ঘরটিতে অপেক্ষা করছি, পাশেই একটি সুবিশাল তাম্রপাত্রে জলে ভাসছে শুধু কয়েকটি তাজা রক্তপদ্ম

শিক্ষিত পৃথিবীর কাছে বাঙালির গর্ব করে বলার মতো মানুষটি বিদায় নিয়েছেন বহুদিন। যতটা সম্ভব অন্তরালে, অবহেলায় তাঁর জন্মশতবর্ষ এই কিছুদিন আগে পালন করেছে বাঙালি।

সত্যি বলতে, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন খাটো মানুষগুলিরই দাপট বেশি। কারণ, এটা মঞ্চের যুগ। বক্তৃতামঞ্চের, নাটমঞ্চের। রেডিয়ো, টিভি, খবরের কাগজের পাদপ্রদীপ সারা পৃথিবীতেই কত সহজে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে মহামনীষী বানিয়ে দিচ্ছে। যারা সে যুগে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল তাদের সঙ্গে এ-যুগের মানুষের মানসিকতায় বোধহয় খুব একটা পার্থক্য নেই।

এ যুগে তাই ঋষির চেয়ে তবলা-বাজিয়ের কদর বেশি। তবু আমাদের বাঙালিদের কাছে সান্ত্বনা ছিল, একজন ঋষি ছিলেন আমাদের।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম 'শেষের কবিতা' পড়ার অনেক আগেই। তারপর একসময় কোনো আসরে কিংবা বিবাহ-বাসরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছি, তাঁর অনর্গল পাণ্ডিত্যের বিশ্বভ্রমণ তন্ময় হয়ে শুনেছি।

প্রথম আলাপ যেদিন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গেলাম তাঁর কাছে, কোনো স্বর্গত সাহিত্যিকের দুস্থ পরিবারবর্গের জন্যে সরকারি সাহায্য আদায়ের চেষ্টায়। প্রসঙ্গত, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ বছর শতবর্ষ।

নির্জন নিঃশব্দ বসার ঘরটিতে অপেক্ষা করছি, পাশেই একটি সুবিশাল তাম্রপাত্রে জলে ভাসছে শুধু কয়েকটি তাজা রক্তপদ্ম। কোথাও আর কোনো ফুলের বাহুল্য নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোজনরসিক অনর্গল-বাক্ মানুষটির ভিতরটা যেন এক লহমায় দেখতে পেলাম। আর তখনই সিঁড়ি ভেঙে নামা চটির শব্দ মিলিয়ে গিয়ে অশীতিপর সেই বলিষ্ঠ যুবক সশরীরে উপস্থিত। পরিচয় করিয়ে দিতে না দিতেই বলে উঠলেন, আরে আসুন আসুন।

অক্লেশে আবার নিঃশব্দ সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। তার তিনতলার ঘরের চারপাশে বই, বই, আর বইয়ের মাঝখানে ফিরে গিয়ে যেন স্বস্তি পেলেন সুনীতিকুমার।

উদ্দেশ্য শোনামাত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন, দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখে দিলেন। টেলিফোন করবেন কাকে কাকে তাও জানালেন। এমনকি প্রয়োজন হলে কার সঙ্গে দেখা করবেন, তাও।

তারপরই সাহিত্যিকের আর্থিক অবস্থা থেকে সে যুগের সামাজিক অবস্থা। কবি-কথার অর্থ যে কবিতা-লিখিয়ে নয়, গল্পকার-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক থেকে ঋষি পর্যন্ত সকলেই কবি, বেদব্যাস বাল্মীকির তো এত সম্মান, অথচ প্রাচীনকালে এদেশে কোথায় কখন লেখক এবং শিল্পীদের বসবাস করতে হত গ্রামের বাইরে, বৃক্ষমূলে, তা থেকে চারণ এবং সুত, ব্রাত্যোস্তোমর বিধানে তাদের কীভাবে ব্রাহ্মণত্ব গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই ফাঁকে ফাঁকে সরস রসিকতা এবং বিশ্বভ্রমণ।

ফেরার পথে মনে হয়েছিল একটি ঘণ্টায় আমি অনেক কিছু জেনে গেছি এবং সেই সত্যটি হল এই যে, আমি কিছুই জানি না।

এরপরেও তাঁর কাছে কয়েকবার যাবার সৌভাগ্য হয়েছে।

কী যেন বলেছিলাম তাঁকে, ভুরু কুঁচকে কান পেতে শোনার এমন ভঙ্গি করলেন অস্বস্তি বোধ করলাম। তারপরই হঠাৎ বলে উঠলেন, বদ্দমানের সঙ্গে মেদনীপুরের টান কেন?

হেসেছিলাম সব শুনে, আর আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ প্রথমটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না চল্লিশ বছর বয়স অবধি, যদিও সেটি আমার জন্মভূমি। আর দ্বিতীয়টি আমার জন্মস্থান হলেও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর কলকাতায় বসবাস করে আমার মতো করে আমার ধারণা ছিল, আমি পুরোপুরি ভাষা বদলে ফেলেছি।

অবাক হওয়ারই কথা, কারণ আজ অবধি অন্য কেউই এই কথাটা আবিষ্কার করতে পারেননি, কারণ সযত্নে ও দুটো প্রভাব লুকোবারই চেষ্টা করে এসেছি।

এরপরও যখনই গিয়েছি তিনি সদাহাস্য অকৃপণ বক্তা।

একটি দিনের কথা মনে আছে। যথারীতি তাঁর গল্প চলছে, সেদিন তাঁর বসার ঘরেই, নীচে। হঠাৎ টেলিফোন এল। উঠে গেলেন পাশের ঘরে। দু-চারটি কথা ইংরেজিতে, তারপর বহুক্ষণ অনর্গল কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলে গেলেন টেলিফোনে।

জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, তাই আজও জানি না কোন্ ভাষা!

কিন্তু বহুভাষাবিদ এটাই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক, যিনি ভাষার নাড়িনক্ষত্র পরীক্ষা করে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতেন।

তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল, যিনি সবসময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, তাঁরই বিলিয়ে দেবার মতো প্রচুর অবসর থাকে।

হঠাৎ টেলিফোন এল। উঠে গেলেন পাশের ঘরে। দু-চারটি কথা ইংরেজিতে, তারপর বহুক্ষণ অনর্গল কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলে গেলেন টেলিফোনে। কিন্তু বহুভাষাবিদ এটাই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক, যিনি ভাষার নাড়িনক্ষত্র পরীক্ষা করে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতেন।

জনমত

শকুন ও শিশুকন্যা : বিশ্বখ্যাত একটি ছবির পঁচিশ বছর

গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দক্ষিণ সুদানের ঊষর প্রান্তে টলমল পায়ে ত্রাণশিবিরের দিকে এগিয়ে চলা এক অস্থিচর্মসার শিশুকন্যা হঠাৎ চরম ক্লান্তিতে মাটিতে মাথা গুঁজে বসে পড়ে আর পেছনে নিঃশব্দে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক ক্ষুধার্ত শকুন। ১৯৯৩ সালের মার্চে চিত্রসাংবাদিক কেভিন কার্টারের তোলা এই পৃথিবীবিখ্যাত পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি এবছর ২৫ বছরে পড়ল। ছবিটি কেভিনকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। কারণ শিশুটিকে ওই অবস্থায় ছেড়ে আসায় তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অমানবিক, এমনকি ওই শকুন ও তাঁর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই-এমন কথাও শুনতে হয়েছে, যা তাঁকে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে।

দৈনিক সংবাদপত্র কিংবা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা এরকম নানা ছবিই দেখি যা আমাদের মানসপটে জোরালো আঘাত করে, ভাবতে বাধ্য করে। মুহূর্তে পৌঁছে দেয় সেই প্রেক্ষাপটে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে সেইসব চিত্রসাংবাদিকেরা অসম্ভব পারদর্শিতায় মুহূর্তে এমন কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন যা তাঁদের পেশাগত দিক থেকেই নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। তাঁরা হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রধান মুখ, যা যুগে যুগে বিভিন্ন জেনারেশনকে ইতিহাস সচেতনও করে।

এরকমই একটি ছবি হল রয়টার্সের চিত্রসাংবাদিক অর্ক দত্তের তোলা কুতুবুদ্দিন আনসারির দুহাত জড়ো করে আতঙ্কগ্রস্ত রহমত ভিক্ষার ছবি, যা মুহূর্তে আমাদের ২০০২ সালের গুজরাটের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে পৌঁছে দেয়।

এরকম অনেক হতভাগ্য আছেন যাঁরা এমনকি নিজের প্রাণ দিয়েও পুরো ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন, যাঁদের আমরা স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে পারব না বা যাঁদের মোছা যায় না। এরকমই হতভাগ্য নয় বছরের দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিম ফুক নামের এক মেয়ে, যার গ্রাম আমেরিকার নাপাম বোমায় পুড়ছে। এসময় এপি-র বিশ্বখ্যাত চিত্রগ্রাহক নিক উট মর্মস্পর্শী একটি ছবি তুললেন (৮ জুন, ১৯৭১)। যাতে কিম বিধ্বস্ত অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলন্ত শরীরে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। নিক উটকে এই ছবি পুলিৎজার পুরস্কার এনে দেয়। নিক উটদের কাছে সারা বিশ্ব কৃতজ্ঞ। ইউপিআই-এর জাপানি সাংবাদিক কিউচি সাওয়াদা জলস্রোতে ভেসে যাওয়া সন্তানদের বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এমন এক মহিলার ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন (১৯৬৫)। সাওয়াদা তাঁর পুলিৎজারের অর্ধেক অর্থমূল্যই ভিয়েতনামের ওই মহিলাকে দিয়েছিলেন। মনস্তত্ত্ব বলে, হাজারো শব্দের চেয়ে কোনো ঘটনার একটি সঠিক ছবি হাজারো জোরালো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা একটি ভিডিয়ো চিত্রের সাহায্যেও সম্ভব নয়।

সৌম্যজিৎ দে, শিক্ষক
দেশবন্ধু পাড়া, জলপাইগুড়ি।

বিপদ বাড়াচ্ছে স্মার্টফোন

দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল ফোনের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ট্রেনের টিকিট থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক বিল, টিভি রিচার্জ, পেটিএম, সর্বক্ষেত্রেই স্মার্ট ফোনের ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ। ফোন ছাড়া কোনোকিছু ভাবা কষ্টকর। কিন্তু পরিবেশের ক্ষেত্রে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে এটি আইটি ক্ষেত্রে সবথেকে ক্ষতিকর উপাদানে পরিণত হবে। সাম্প্রতিকতম এক গবেষণায় এমনি আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। তাই স্মার্টফোন ব্যবহারের বিষয়ে এখন থেকেই সচেতন হতে হবে।

ফ্রান্সিস ভগত
বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

সরকারি স্কুলেও ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা !

সরকারি বিদ্যালয়েও ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা শুরু হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, সরকার প্রাথমিক স্তরেও এই প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে। এটা এখনও স্পষ্ট নয় যে পুরো স্কুলটাই ইংরেজিমাধ্যম হয়ে যাবে নাকি আংশিক হবে। এখন পর্যন্ত যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, স্কুলে একটি ইংরেজিমাধ্যম বিভাগ আলাদা হবে যাতে করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলগুলিতে ভরতি হওয়ার প্রবণতা কমে। তা হলে মানে দাঁড়াচ্ছে, এ ব্যবস্থা যতটা না ইংরেজি শেখার জন্য তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য ইংরেজিমাধ্যমে ভরতির বর্তমান সামাজিক ঢলকে রোখার।

প্রশ্ন হল, যাঁরা তথাকথিত নামি ইংরেজি বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্টেটাস সিম্বল রক্ষার জন্য সন্তানদের ভরতি করান তাঁরা কি এই সরকারি বিদ্যালয়ে আসবেন ? বোধ হয়, না। ইংরেজিমাধ্যমে পড়লে জীবনে সার্বিক উন্নতি করা যাবে, সহজ হবে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাবে- এই যখন ধারণা তখন বাংলামাধ্যমে যারা পড়বে তাদের নিয়ে একই বিদ্যালয়ে দুটো শ্রেণি তৈরি হবে নাকি! এর অন্য দিকও আছে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার সংস্কৃতি, ভাব, চালচলন, আদবকায়দা সেই ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে। দেখলে তা বোঝা যায়। এদিক-ওদিক তাকালে এ পার্থক্য চোখে পড়ে। তাহলে ভাগটা হয়তো এমন দাঁড়াবে-বিদ্যালয়ে এক দল হবে শহুরে ধোপদুরস্ত, আর এক দল তেমনটা নয়। অপরদিকে দরকার হবে এদের জন্য ইংরেজিমাধ্যমে পড়া শিক্ষকের। নাকি যাঁরা আছেন তাঁরাই পড়াবেন ?

বিমলকৃষ্ণ দাস
জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

জলপাইগুড়ি শহরে জলবদ্ধতা

জলপাইগুড়ি শহরের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সেই টিনের বাড়ির সঙ্গে অপ্রশস্ত শহরের ইতিউতি ভাঙাচোরা রাস্তাগুলি আজ ঝাঁ চকচকে হয়েছে। অন্য যে কোনো শহরের তুলনায় আজ জলপাইগুড়ি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। শহরের যেখানে সেখানে পাঁচতলা রংচঙে আবাসন, বিভিন্ন কোম্পানির আকাশছোঁয়া কাচে ঘেরা ঝকঝকে দোকান চোখে পড়ার মতো। মোড়ে মোড়ে সুউচ্চ, বাতিস্তম্ভ। নব্যরূপে সেজে উঠেছে এই শহর। দেখলাম বাবুঘাটেও বাতিস্তম্ভের কাজ শুরু হয়েছে, যেটা মনে হয় বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল বাবুঘাটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই কর্মকাণ্ডের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদপ্রাপ্য পুর কর্তৃপক্ষের।

কিন্তু এটা মানতেই হবে বর্ষায় জলবদ্ধতা আরও বেড়ে গিয়েছে বিগত বছরগুলির তুলনায়। কারণ সুউচ্চ আবাসন ও দোকানগুলি হওয়ায় প্রবেশপথের জলবাহী বড়ো নালাগুলির ওপর কংক্রিট স্ল্যাব বসিয়ে কিছু কিছু আবাসন বা দোকানের নালায় ছোটো ছোটো কাউক্যাচার লাগানো হচ্ছে। যার জন্য পুরসভার সাফাই কর্মীদের পক্ষে রাস্তার দু-পাশের বড়ো নালাগুলি পরিষ্কার করা অসম্ভব। তাই লক্ষ করা গেছে বিগত বছরগুলির তুলনায় গতবছর জলবদ্ধতার দরুন যেসব বাড়িতে বর্ষায় কোনোদিন জল উঠত না, সেই বাড়িগুলিতেও জল উঠেছে। যা ভবিষ্যতে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। ওয়ার্ডগুলিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের অনিয়মিত ময়লা তুলতে আসায় নাগরিকরা বাধ্য হয়ে যাবতীয় নোংরা রাস্তার ধারে অথবা বড়ো নালায় ফেলে নালা ভরাট করে দেয়। তাই পুর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, রাস্তার পাশে বড়ো নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নিন।

কমল ভাওয়াল
সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি।

ডুয়ার্সে সরকারি বাস চাই

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সম্প্রতি ৭০টি নতুন বাস পেয়েছে। আরও ৯৬টি নতুন বাস আসছে। পরিতাপের বিষয়, ডুয়ার্সের ভাগ্যে একটি বাসও জোটেনি। বেশিরভাগ বাস চলছে কোচবিহার রুটে। জয়গাঁ, কালচিনি, টোটোপাড়া, মাদারিহাট, নাগরাকাটা রুটে অন্তত ২টি করে বাস ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি ডিপো থেকে চালানোর জন্য অনুরোধ রাখছি। এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, এই পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির দিকে নজর দিন।

অরূপ রায়
কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

ওভারব্রিজ চাই দেওয়ানহাটে

কোচবিহার জেলার দেওয়ানহাট রেলগেটে ওভারব্রিজ চাই। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক, কয়েকশো বাস কোচবিহার, দিনহাটা, বামনহাট, সিতাই সহ একাধিক জায়গায় যাতায়াত করে থাকে। দেওয়ানহাটের উপর দিয়ে যে রেললাইন গেছে তা দিয়ে বামনহাট, কোচবিহার, কলকাতাগামী কয়েকটি ট্রেন যাতায়াত করে থাকে।

বিশেষ করে অফিস টাইমে প্রতিদিন রেলগেট বন্ধ হলে যানজটের সৃষ্টি হয়। এই যানজট খুলতে বেশ সময় লেগে যায়। এতে করে একদিকে অফিসযাত্রীদের সময় অপচয়, অন্যদিকে অ্যাম্বুলেন্সে আটকে পড়া মুমূর্ষু রোগীদের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন এখানে একটি রেল ওভারব্রিজ করা হোক।

গৌতম দাস
উল্লারঘাট রোড, তুফানগঞ্জ।

উধাও হাসি

হাসি নিরুদ্দেশ। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দীর্ঘদিন। মানুষ এখন রামগরুড়ের ছানা/হাসতে যাদের মানা। জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষ হাসতে ভুলে যাচ্ছে। কাষ্ঠহাসিও এখন বিরল। এরফলে দেহে-মনে বাসা বাঁধছে নানা ব্যাধি।

সামিম আখতার বানু
সোনাবাড়ি, মিরুয়াল, রায়গঞ্জ।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আরও কঠোর হতে হবে

বাল্যবিবাহ এখনও আমাদের দেশের গ্রাম্য এলাকায় এমনকি শহরাঞ্চলেও হয়ে আসছে। আর এই বিবাহের ফলে আমাদের দেশের অসংখ্য পরিবারে বিভিন্ন প্রকার মানসিক পীড়া ও রোগের সৃষ্টি হয়েই আসছে।

আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে আমাদের দেশের নিষ্পাপ মেয়েরা। কারণ আমাদের দেশের মেয়েরা বাবা-মায়ের উপর কিছু বলতে পারে না। আর কেউ বলতে চাইলে মা-বাবারা বা সমাজের কেউ সেই মেয়েটির প্রতিবাদকে শুনতে চায় না এবং বিয়ে দিয়ে দেয়।

বাল্যবিবাহ শুধু মেয়েদেরই হয় না, আমাদের দেশে ছেলেদেরও বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। এক্ষেত্রে আমি অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেদেরকেও দোষারোপ করব। কারণ কিছু ছেলে আছে যারা মা-বাবার কথা না মেনেই প্রেম করে বিয়ে করে নেয়। আর সন্তানের এই ভুলটা মা-বাবারা মুখ বুজে মেনে নেয়।

বিয়ের পরবর্তী জীবন কেমন হবে, সংসার জিনিসটা কী ইত্যাদি জানার ক্ষমতা তখন সেই অল্পবয়সি মেয়ে বা ছেলেটার থাকে না। আর সে কারণে মেয়েরা সন্তানের লালনপালন করার কোনো পদ্ধতিও বুঝতে পারে না। যখন তারা মা হয় তখন তাদের তো পুষ্টির অভাব থাকেই, সেই সঙ্গে যে সন্তানটি পৃথিবীতে আসে তারও পুষ্টির অভাব দেখা দেয়, আর সেই সন্তানের বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। কিছু ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুও হয়।

বাল্যবিবাহ ভারতীয় আইনানুযায়ী অনেক বড়ো অপরাধ, আর এর জন্য আপনার জেলও হতে পারে। তাই আমি সকল অভিভাবকদের অনুরোধ করছি যে আপনারা আপনাদের সন্তানের জীবনটা মৃত্যুর মুখে না দিয়ে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করুন। যেখানে অভিভাবক সব বুঝেও অল্পবয়স্ক সন্তানের বিয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমি দেখতে পাই অনেক সময় প্রশাসন লোভে পড়ে বিক্রি হয়ে যায়। অনেক অভিভাবক পুলিশকে টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। স্কুল থেকে বয়স বেশি দেখিয়ে ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে, কোর্ট থেকে এফিডেভিট করে ভুল বয়সের প্রমাণ নিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করায়। তাই আমার অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির কাছে, যেসব ঘুস খাওয়া পুলিশ, প্রধান শিক্ষক, উকিল ও বিয়ে রেজিস্ট্রার অবৈধভাবে বিয়ে দিচ্ছে তাদের জন্য কোনো আইন গ্রহণ করুন এবং সেই সমস্ত ঘুস খাওয়া লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত অভিভাবকদেরও শাস্তি দিন। ভারতকে সুস্থ রাখতে হলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতেই হবে। আর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে পারলে আমাদের দেশ ধীরে ধীরে শিখরে উঠবে।

নীলকণ্ঠ মণ্ডল
ভুতনি, মালদা।